Vol. 28 | No. 2 | 1985

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

হাসান হাফিজুর রহমানের ছোটগল্প

Volume	28
Issue	2
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রফিকউল্লাহ খান
Published online	February 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v28i2.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i2.9
Pages	241-270
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

হাসান হাফিজুর রহমানের ছোটগল্প

রফিকউল্লাহ খান

কবিতায় সাফল্য এবং সিদ্ধির শিখর স্পর্শ করলেও হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩২-১৯৮৩) সাহিত্যিক অভিযাত্রা সূচিত হয়েছিলো ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে।[১] জীবন ও জগতের যে খণ্ড খণ্ড বস্তুনিষ্ঠ উপাদানকে তিনি গল্পের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তা তাঁর জীবনাদর্শের ক্ষেত্রে কোনো অপূর্ণতা নির্দেশ করেনা, সমস্ত সৃষ্টিকর্মের সাথে সঙ্গতিরক্ষার মাধ্যমে হয়ে ওঠে যথার্থ—অভিন্ন জীবনবোধের শিল্পরূপ। যে বস্তুবাদী বিশ্ব-নিরীক্ষা তাঁর কবিতার স্বাতন্ত্র্যের প্রাণবিন্দু, ছোটগল্পের শরীরে ও বক্তব্যে তার প্রথম অঙ্কুরোদ্‌গম। প্রথম গল্পগ্রন্থ "আরো দুটি মৃত্যু"[২]র অধিকাংশ গল্পই হাসান হাফিজুর রহমানের জীবনজিজ্ঞাসা ও শিল্পাদর্শের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্তি, বৃহত্তর জনজীবনসম্পর্কিত গভীর উপলব্ধি, ধর্মনিরপেক্ষ উদারমানব-তাবাদী মুক্তদৃষ্টি এবং সমকালীন সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক অস্থিরতা-অবরুদ্ধতার মধ্যেও ইতিবাচক সম্মুখভাবনায় উজ্জীবিত স্রষ্টাচৈতন্য গোড়া থেকেই তাঁর শিল্পপ্রেরণার মৌল উৎস হিসেবে বিদ্যমান। যে কারণে বিভাগ-পূর্ব ও বিভাগোত্তর কালের বাঙালি জীবনের সামগ্রিক সংকটের পটভূমিতেও জীবনবোধ ও শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উত্তরণকামী জীবনাবেগে উজ্জ্বল। গভীর অধ্যয়ন ও অবলোকনের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী নিরীক্ষা এই নবতর জীবনাবেগ ও শিল্পাদর্শের কার্যকারণ। একটা দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ জীবনচেতনা তাঁর সূচনাকালীন সৃষ্টিশীলতার গৌরবময় প্রাণবিন্দু। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মন্বন্তর, মহামারী, শ্রমজীবী মানুষের জীবনচিত্র, জীবনের দৈনন্দিনতা ও অন্তর্লোক এবং সর্বোপরি মানুষের জাগতিক ও মানসিক দ্বন্দ্বৈচিত্র্যকে গল্পের উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মধ্যেও তিনি জীবনের

সম্ভাবনা সম্পর্কে ছিলেন নিঃসংশয়, মতাদর্শের প্রশ্নে ছিলেন সীমাংসিত। যার ফলে, তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতে জীবনের সম্ভাবনাদীপ্ত উদার উন্মুক্ত বিশালতার-ই উন্মোচন ঘটেছে।

হাসান হাফিজুর রহমানের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ "আরো দুটি মৃত্যু"। উল্লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও তার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত আরো আটটি গল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে। লেখকের ছোটগাল্পিক জীবনান্বেষা ও শিল্পচেতনার স্বরূপ উন্মোচনে সব গল্পই বর্তমান আলোচনায় বিবেচ্য।

এক

"আরো দুটি মৃত্যু" গ্রন্থে বিন্যস্ত হয়েছে দশটি গল্প। এ-গ্রন্থের প্রথম গল্প হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত 'আরো দুটি মৃত্যু' হাসান হাফিজুর রহমানের জীবনবোধের গৌরবময় বিশেষত্বনির্দেশক। এই একটিমাত্র গল্পই তাঁকে বৃহত্তর পাঠকসমাজ ও সমালোচকের কাছে পঠন ও আলোচনার উজ্জ্বল অনুষঙ্গে পরিণত করেছে। অন্যান্য গল্পেও লেখকের বৈচিত্র্যময় বিষয়-অন্বেষার পরিচয় বিধৃত। জীবন ও মানুষের প্রতি ঐকান্তিক মমত্ববোধ যে একজন শিল্পীকে সাফল্য ও খ্যাতির শীর্ষদেশে স্থাপন করে, 'আরো দুটি মৃত্যু' তার সার্থক দৃষ্টান্ত। গ্রন্থভুক্ত গল্পসমূহের তালিকা নিম্নরূপ : ১. আরো দুটি মৃত্যু, ২. মানুষের মন, ৩. ছায়াহীন পক্ষ্মহীন পলকহীন, ৪. অপমৃত্যু, ৫. মাছ, ৬. বৌ, ৭. মাণিকজোড়, ৮. অনুতপ্ত পিতা, ৯. ইচ্ছার দেয়াল, ১০. পাখি।

একটা চলমান ট্রেনে সংঘটিত ঘটনাপুঞ্জকে লেখক নিপুণ কৌশলে শিল্প-মণ্ডিত করেছেন 'আরো দুটি মৃত্যু' গল্পে। সমগ্র ঘটনার কেন্দ্রমূলে রয়েছে বাঙালির জাতীয় জীবনের এক অনভিপ্রেত ট্র্যাজেডি—হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। একজন প্রসবযন্ত্রণাকাতর নারীর মর্মান্তিক পরিণতির মধ্য দিয়ে এই সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য চারিত্র উন্মোচিত হয়েছে গল্পে। প্রসবযন্ত্রণাকাতর মাতৃত্ব ও তার গর্ভস্থিত জীবনসম্ভাবনার অপমৃত্যু যেন আমাদের জাতীয়তাবোধ ও তার নেতিবাচকতাকে ধারণ করেই হয়ে উঠেছে ইঙ্গিতময়, ব্যঞ্জনাময়। অন্ধকারের কালো পটভূমিতে গল্প-কাহিনীর উন্মোচন এবং কাহিনী উপস্থাপনে লেখক প্রান্তিক চরিত্রের দৃষ্টিকোণ বা প্রেক্ষণবিন্দু

ব্যবহার করেছেন। কাহিনী উত্তম পুরুষে বর্ণিত হলেও, সমালোচকের ভাষায় গল্পবিধৃত বর্ণনাকারীকে বলা যায় 'Narrator is a minor chareacter or merely an observer।'[৩] 'আরো দুটি মৃত্যু' গল্পের উপস্থাপক বা কথক যুগপৎ দর্শক ও অণুসূক্ষ্ম বর্ণনাকারী। গল্পের সূচনাংশ নিম্নরূপ :

> নারায়ণগঞ্জ থেকে বাহাদুরাবাদ যাচ্ছে যে রাত্রির ট্রেনটা, এই যে স্টেশনে এসে থামলো, মাত্র দু মিনিট দাঁড়ায় এখানে। অন্ধকার রাত কিছুই চোখে পড়ছে না। স্টেশন ঘরটার জানালা ও দরজায় যে আলোর আভাস ছিল চোখের ওপর অকস্মাৎ ঝাপটা দিয়ে চলে গেছে ট্রেন থামতে না থামতেই। কামরাগুলোর আলোকিত গহ্বরকে চারিদিক থেকে মুড়ে দিয়েছে কালো রাত।[৪]

এই 'আলোকিত গহবরকে ··· কালোরাত' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে গল্পের অন্বিষ্ট বিষয় ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে পাঠকচৈতন্যে। জাতীয় জীবনের চলমান-তার সাথে ট্রেনকে পরস্পরিত করেছেন লেখক, যেখানে কখনো কখনো জীবনের নিরাপত্তা, মানবিক চেতনা, শুভবুদ্ধি হয় বিপন্ন, বর্ধিষ্ণু জন-স্রোত কখনো হয়ে ওঠে ধারণ-অযোগ্য, এবং তখন উচ্চারিত হয় 'এহানে জাগা নাই, এহানে জাগা নাই'; কিন্তু জীবনের গতি এতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে না, যথাসময়ে ঘণ্টি বেজে ওঠে স্টেশনের, ট্রেনের চলার গতিও থাকে অপ্রতিহত। এভাবেই একটা শ্বাসরুদ্ধকর সামাজিক অবস্থা ও তার মর্মন্তুদ প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে গল্পে। ট্রেনের স্টেশন ত্যাগের মুহূর্তে 'প্রথমে একটি পুটলি ও টিনের সুটকেস ঠেলে দিয়ে ভেতরে উঠলেন প্রৌঢ় একজন হিন্দু ভদ্রলোক। সাধারণ ধুতি কাপড় পরেছে, ঘিয়ে রঙের চাদর গায়ে জড়ানো। দাঁড়াবার একটু জায়গা করে নিয়েই হাত বাড়িয়ে নীচে থেকে কিছু তোলার জন্যে এমন সযত্ন ভঙ্গিতে চেষ্টা করতে লাগলেন যেন ঠুনকো কাঁচের কিছু তুলছেন। কিন্তু যা তুললেন তা একজন মেয়েলোক। মধ্যবয়স্কা, প্রায় তিরিশ।'[৫] গল্পবিধৃত প্রান্তিক চরিত্রের কৌতূহল ও অনুভবের কেন্দ্রবিন্দু উক্ত হিন্দু ভদ্রলোক ও তার সহযাত্রী মধ্যবয়স্কা মেয়েটি। বর্ণনাকারী স্বাভাবিক হতে পারছেন না হিন্দু ভদ্রলোকটির সাথে, আন্তরিক তাগিদ সত্ত্বেও। কেননা পঞ্চাশের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার স্বরূপসত্য তাঁর অভিজ্ঞতায় দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। একটা

ক্লান্তির স্তব্ধতা ও আতঙ্ক আচ্ছন্ন করে রাখে কাহিনী উপস্থাপক ও তার পরিপার্শ্বকে 'এ স্তব্ধতা যে শুধু ক্লান্তির তা নয়—আতঙ্কেরও। আমি ঢাকা থেকে আসছি, সেজন্য এ অনুভূতিটা আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। পরস্পরের প্রীতির ওপরেই যেমন সামাজিক সুস্থতার নির্ভর, তেমনি পরস্পরের আক্রোশের ভেতরেই সবচেয়ে বড় অশান্তি। এ অশান্তি যে কি আমি জেনেছি ঢাকার দাঙ্গায়, কলিকাতার পরেই যা শুরু হয়েছিল।'[৬] বর্ণনাকারীর অভিজ্ঞতায় হিংস্রতার ভয়াবহ রূপ ও আতঙ্কগ্রস্ত জনজীবন সীমাহীন অস্বস্তি ও অশান্তি সঞ্চার করেছে। কিন্তু কথকের চেতনার অন্ধকারের পরিবর্তে আলোর ইঙ্গিত-ই হয়ে ওঠে মুখ্য। কেননা, যেখান থেকে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, সেখানে 'আকাশে প্রান্তরে ছিল শীত আর মানুষের মুখে মুখে ছিল স্তব্ধতা আর আতঙ্ক। আর অন্যদিকে শান্তিকামী কলোনীর সারা ঠাঁই জুড়ে সেকি প্রতিরোধ, দাঙ্গাকে রুখতে প্রাণান্ত হয়েছিল।'[৭] লেখকের মানস-প্রতিভাসের প্রতিমূর্তি বর্ণনাকারীর মধ্যে শুভবুদ্ধি ও চেতনা জাগ্রত হয়। অদম্য কৌতূহল ও মানবিক ঔদার্য থেকে সে স্বাভাবিক হতে চায় হিন্দু ভদ্রলোকটির সাথে। তার দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দু ভদ্রলোক ও পরিপার্শ্বের অবস্থার চিত্র নিম্নরূপ :

> ভয় আর আতঙ্কে মুখটা তার চুপসে গেছে, ফ্যাকাশেও হয়েছে, বেশ একটু দূরে বসলেও আমার নজরে পড়লো। লোকটা পরে এসেছে ধুতি, তিনটি মানুষের ভেতরে কারুরই—ওরা যে হিন্দু এই ইঙ্গিতটি লুকিয়ে ঢেকে রাখবার এতটুকুও চেষ্টা নাই। অথচ ট্রেনটা নিরাপদ এমন মনে করবার কোনো কারণ আছে বলে ভাবা যায় না। ট্রেনেও খুন-খারাপি হয়েছে এবং হচ্ছে। একজন হিন্দুর পক্ষে বিপদটা এখানেও কম নয়। লোকটা একথা জানে বলেই মনে হলো। উট পাখি যেমন বালুতে মুখ লুকিয়ে বিপদ এড়ানোর চেষ্টা করে, তেমনি আমাদের কারো দিকে একবার পর্যন্ত না তাকিয়ে ভয় আর আশঙ্কা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্রাণপণে নিজেকে শক্ত করে রাখছে।[৮]

একটা 'ক্লান্ত গুমোট ভাব' সমস্ত পরিবেশকে আচ্ছন্ন করে রাখে—যা সূক্ষ্মভাবে কোনো ভয়ানক বিষয়েরই ইঙ্গিত বহন করে। 'লোকটা

যমুনার গাঢ় জলের মতো ঘোলা দৃষ্টিহীন চোখ মেলে আছে।'[৯] কৌতূহল, উৎকণ্ঠা ও অনুধ্যানের মধ্য দিয়ে এভাবেই লেখক ক্রমাগত জাতিসত্তার অন্তর্গত ক্লেদ, বিভীষিকা ও রক্তক্ষরণের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। প্রসব যন্ত্রণাকাতর মেয়েটি এক পর্যায়ে দৃশ্যপট থেকে অন্তর্হিত হয়: 'মেয়েটা সেখানে থাকতে পারলো না আর। বেদনা এখন সারা দেহে সংক্রমিত হয়ে পেশীগুলো উৎক্ষিপ্ত করছে। অবশেষে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে পায়খানার ভেতর চলে গেলো, নিজেকে প্রাণান্ত চেষ্টায় হেঁচড়িয়ে টানতে টানতে।'[১০] একটা নবজন্মের সম্ভাবনা ও ফলাফল দর্শনের জন্য উদগ্রীব বর্ণনাকারী ট্রেনের শেষ গন্তব্যে পৌঁছে অবিশ্বাস্য ও ভয়ঙ্কর পরিণতি প্রত্যক্ষ করে। একটা চলমানতার পটভূমিতে আকাঙ্ক্ষায় উৎকীর্ণ বর্ণনাকারী ও সময়, কেননা, 'হয়তো নবজাত শিশুর কোমল কান্নার এই ভয়াবহ ফসিলের মতো স্তব্ধতা এক আর্ত নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ তীব্র প্রতিবাদে দুমড়িয়ে যাবে এই স্থবিরতা। এই প্রাণান্তকর গাম্ভীর্যের অবসান হবে নবজাত সৃষ্টির কলকণ্ঠে।'[১১] কিন্তু কাহিনীর গতিধারা অন্যতর সত্যকে ধারণ করে এই স্তব্ধতা, আতঙ্ক ও আশঙ্কাকে এক ভয়ানক বাস্তব পটভূমিতে নিক্ষেপ করলো। পায়খানার ভেতরই এক অদৃশ্য হিংস্র দানবের পৈশাচিক নখর নির্মমভাবে হত্যা করেছে মেয়েলোকটিকে, তার গর্ভনিহিত নবজীবন সম্ভাবনাকে। মাতৃত্বের এই করুণ পরিণাম বাঙালি জাতির স্বদেশভূমির সাথে পরস্পরিত হয়েছে যেন—যার অন্তর্নিহিত নবজীবন সম্ভাবনা বারবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্মম নখরে হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। এই মর্মন্তুদ দৃশ্য উন্মোচনের পরবর্তী দৃশ্য, দৃশ্যহীনতা ও প্রতিক্রিয়া সমগ্র গল্পকাহিনীর গতি ও টেন্‌শনের সমগ্রতায় হয়ে উঠেছে ব্যঞ্জনাময়, প্রাণস্পর্শী:

> চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেলো, সামনে নিরন্ধ্র অন্ধকার। অন্ধকার, যেখানে সম্পূর্ণ একটি নারী দেহ ভেসে উঠেছে। রক্তাক্ত দেহ, মুখ হাঁ হয়ে আছে। পেট অত্যন্ত উঁচু। চোখ উল্টে গেছে বিকৃত হয়ে অসম্ভব বেদনাকে সহ্য করার অস্বাভাবিক চেষ্টায়। একটি মা। একটি মাতৃত্ব আকাঙ্ক্ষী নারী, জীবনের জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুঝেছে। তার ফুলে ওঠা পেটের ভেতর আছে একটি শিশু, একটু আগেও জীবিত ছিল সে। জন্মাতে পারলে অনেক কিছুই হয়তো করতে

পারতো ; সুখী আগামী পৃথিবীর বুকে শ্বাস নিতে পারতো অন্ততঃ। এ জন্মকে রুখলো কে ?

তখনি কি এক যন্ত্রণায় সারা বুকটা কুঁকড়িয়ে উঠলো আমার। আর কি ঘৃণা। ধ্বংসের জন্যে ঘৃণা। অসহ্য।

প্রৌঢ় লোকটার মুখ আমি মনে করতে পারিনে আর ; কিন্তু তার ওই স্তব্ধতাটি এখনও আমার বুকের ভেতর জড়িয়ে আছে।[১২]

আতঙ্ক, ঘৃণা, উদ্বেগ, অস্থিরতা ও স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে 'আরো দুটি মৃত্যু' গল্প। কিন্তু 'সুখী আগামী পৃথিবীর' স্বপ্ন-সম্ভাবনাও লেখকের চেতনায় উজ্জ্বল।

'উত্তম পুরুষে লেখা কাহিনীসমূহে সাধারণতঃ নায়ক মুক্তিদৃষ্টিসম্পন্ন সংযতবাক্ হতে বাধ্য হন ; নিজের কথা অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক ঘটনা বিশ্লেষণেই তিনি তৎপর থাকেন এবং সামগ্রিকভাবে একটা জীবনসত্যের উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হন।'[১৩] 'আরো দুটি মৃত্যু' গল্পের কথক কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক না হলেও সে মুক্তদৃষ্টিসম্পন্ন ও সংযতবাক্, তার কৌতূহল ও বিশ্লেষণ নিবদ্ধ পারিপার্শ্বিক জগৎ ও তার ঘটনাপুঞ্জের প্রতি এবং পরিণামে ইতি-বাচক জীবনসত্যে উত্তীর্ণ। জীবনাদর্শের প্রশ্নে শিল্পীর মানবীয় সংবেদন-শীলতা এবং বোধ ও উপলব্ধিতে সুস্থ ও সজীব জীবনপ্রত্যাশা এ-গল্পের গৌরবময় প্রান্ত। গল্পের প্লট বিন্যাসের ক্ষেত্রেও শৈল্পিক সংহতি ও পরিমিতিবোধ 'আরো দুটি মৃত্যু'তে সুস্পষ্ট। নারায়ণগঞ্জ থেকে বাহাদুরা-বাদ পটভূমি হিসেবে যথেষ্ট বিস্তৃত এবং ঘটনা সংঘটনের সময়কাল রাত্রি— রাতের একটা বিস্তৃত পরিসর। বিষয়বিন্যাস, চরিত্রায়ণ, দৃষ্টিকোণ, পরি-চর্যা প্রভৃতি ছোটগাল্পিক শিল্পরীতির মাত্রা ব্যবহারে হাসান হাফিজুর রহমান যুগপৎ নিরাসক্ত ও শিল্পসচেতন। একটি সাধারণ বর্ণনা দিয়ে কাহিনী শুরু হলেও বিষয়ের অনুষঙ্গে গল্পের পরিচর্যা কখনো বিশ্লেষণ-ধর্মী, চিত্রানুগ কখনো-বা ; আবার কখনো কখনো কাব্যময়, ব্যঞ্জনাময়। অবশ্য গল্প-বিষয় বর্ণনা এবং বিশ্লেষণকেই গল্পের চারিত্রধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলে। বর্ণনাত্মক পরিচর্যার একটি দৃষ্টান্ত : 'আমি যেটায় বসে ছিলাম সেটা একটা 'একুশজন বসিবেক' কামরা। ঠাসাঠাসি করে

বসে, একজন অন্যজনের উপর ঢুলে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙছিলাম আর ঘুমাচ্ছিলাম। দু'জন বেপরোয়া লোক উপরে দেদার জায়গা নিয়েছে। আমি নিজে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করছিলাম।'[১৪] বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যায় অন্তর্ময় অনুভবের উন্মোচন ঘটেছে। যেমন, '···একজন প্রসব-উন্মুখ মেয়েকে পথ হাঁটিয়ে আনা, গাড়ীর ঝাঁকুনিতে অন্য কোথায়ও নিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক কথা নয়। এদের সম্পর্কে অন্ততঃ এতটুকু কল্পনাতে আসেনি আমার। কিন্তু এখন ভাবতেই সারা দেহ শির শির করে উঠল। কেমন মানুষ! লোকটাকে ধিক্কার দেবো মনে করলাম, মনে করলাম অভি-সম্পাত করবো। সেজন্য মুখ ফেরালাম। কিন্তু তখনি মনে হলো এ-ছাড়া হয়তো এদের কোনো উপায় ছিলো না। মৃত্যু এদের সবদিক ঘিরে আছে।'[১৫] গল্পের বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্লেষণকে করে তোলে অনিবার্য—চিত্র বা কাব্যময়তার অবকাশ সেখানে অল্প, শুভবুদ্ধি ও চেতনাজাত অনুভূতির যেখানে প্রাধান্য, সেখানে বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যার প্রয়োগ যথার্থ। একটি অংশ উপস্থাপন করা যাক যা অনুভূতির গভীরতা ও বিস্তৃতিতে চিত্রময়তাকে অতিক্রম করে গেছে যেন: 'চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেলো, সামনে নিরন্ধ্র অন্ধকার। অন্ধকার, যেখানে সম্পূর্ণ একটি নারীদেহ ভেসে উঠেছে।—রক্তাক্ত দেহ, মুখ হাঁ হয়ে আছে। পেট অত্যন্ত উঁচু। চোখ উল্টে গেছে বিকৃত হয়ে। অসম্ভব বেদনাকে সহ্য করার অস্বাভাবিক চেষ্টায়।'[১৬] এভাবেই উপাদান ও প্রকরণে 'আরো দুটি মৃত্যু' একটি শিল্পসফল গল্পে উত্তীর্ণ হয়েছে। লেখকের সুতীক্ষ্ণ, অন্তর্ময় ও সত্যসন্ধ জীবনদৃষ্টি এক অখণ্ড প্রতীতি-সমগ্রতায় অভিব্যঞ্জিত—যেখানে জৈবনিক আকাঙ্ক্ষা হয়ে উঠেছে তরঙ্গিত, স্পন্দিত। এই বৈশিষ্ট্যপুঞ্জ নির্ধারণ করেছে তাঁর গল্পের গৌরব ও বিশিষ্টতা। কেননা, লেখকের 'তীক্ষ্ণদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি ও দিব্যদৃষ্টির সুষম ঐক্যে স্ফটিকায়িত হয় ছোটগাল্পিক শিল্পবোধের তন্ময় মহান বিন্দুবৃত্ত, যার অভিব্যঞ্জনায় ভগ্ন চূর্ণ বিশ্ব হয়ে ওঠে প্রতীতি-সমগ্র।'[১৭]

হাসান হাফিজুর রহমানের বৈচিত্র্যসন্ধানী শিল্পঅন্বেষা যুগপৎ বস্তুবিশ্ব ও মনোবিশ্বের অনুধ্যানে সৃজনমুখর হয়ে ওঠে। 'মানুষের মন' গল্পে বহি-র্জগৎ যেন বিলুপ্ত, মনোবিশ্বেরই সেখানে একাধিপত্য। তিনটি চরিত্রের

মানস-আলোড়নের দ্বন্দ্বময় উন্মোচনে, মানব-অস্তিত্বের বহুধাবিস্তৃত ও জটিল স্বরূপসত্যের রহস্য আবিষ্কারে এবং পরিণামে সর্বজ্ঞ লেখকের সংশ্লেষ রচনার মধ্যদিয়ে গভীরতা, বিস্তৃতি ও ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। প্রথাগত বিবেচনায় এ-গল্পকে হয়তো ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে; কিন্তু গল্পের আবেদন কেবল প্রণয়কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি—মানবীয় অস্তিত্বজিজ্ঞাসা ও প্রণয়-অভীপ্সার দ্বন্দ্বজটিল সমন্বয়ে অর্জন করেছে অন্যতর বৈশিষ্ট্য। 'হেলথ স্যানাটোরিয়ামে' চিকিৎসারত মরণোন্মুখ দুইজন তরুণ-তরুণীর অস্তিত্বসজাগতা ও প্রণয়-অভীপ্সার মধ্য দিয়ে গল্প-কাহিনীর উন্মোচন। হৃদরোগে আক্রান্ত লীনা ও কমলের হৃদয়বৃত্তির জীবনময় প্রকাশের মধ্য দিয়ে গল্প সূচনা করেছেন লেখক। তিন পর্বে সমাপ্ত গল্পের প্রথম পর্বে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ, পতিত ও ধূসর জীবনে প্রাণের সঞ্চার উপস্থাপন করতে গিয়ে দৃশ্যময়তা থেকে ক্রমাগত কাব্যময়তা ও অন্তর্ময় ব্যঞ্জনার প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেছে। গল্প-বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যের ফলে এই পরিচর্যা অনিবার্যতা-গুণ অর্জন করেছে:

> হেলথ্ স্যানাটোরিয়াম। মাঝারি এক টিলার ওপর। চারপাশে আরো অজস্র টিলা। যেন টিলার মালা বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে। যে কোনো একটার ওপর উঠলেই দেখা যাবে দক্ষিণে উন্মথিত হয়ে আছে উচ্ছ্বসিত সমুদ্র। পিপুল, অশ্বত্থ, পাইন ও অশোক গাছে নিবিড় চারদিকের টিলামথিত প্রকৃতি। সমুদ্রের উচ্ছ্বাস, হাওয়ার গর্জন আর গাছের মর্মরে মুখরিত নৈঃশব্দ্য। স্তব্ধতার এমন আকুলিত আলোড়ন আর বুঝি কোথাও নেই।
>
> স্যানাটোরিয়ামের টিলাভূমি থেকে কয়েকটা কালো সুমসৃণ পীচের রাস্তা এঁকে বেঁকে অন্তহীন অজগরের মত সুদূরে উধাও হয়েছে। তারই একটা গিয়ে মিশেছে সমুদ্রে। তাই এখানে উঠে এসে দক্ষিণমুখী হয়ে দাঁড়ালে মনে হয় যেন, ঐ কালো পীচের রাস্তার পথ ধরে সমুদ্র ডাকছে নেমে যেতে হবে এক্ষুণি।
>
> লীনা ও কমলও বুঝি সমুদ্রের সেই ডাক শুনেছিলো, বুকে বেজে উঠেছিলো অশ্রান্ত-অশান্ত অবাধ্য হাওয়ার গর্জন। পল্লবের

অজস্র উচ্চকিত মর্মরে মর্মরিত হয়ে উঠছিলো বুঝি ওদেরও উদ্বেলিত তনুমন।[১৮]

মানব-মনের ওপর পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনিবার্য প্রভাবকে বৈজ্ঞানিক সত্যের মতো মনে হয় লীনা ও কমলের চিত্তজাগতিক প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ পর্যবেক্ষণ ক'রে। লেখক সচেতনভাবে বহির্জাগতিক পরিবেশ এবং সেই পরিবেশজাত প্রতিক্রিয়ার অর্ন্তসত্য বিন্যস্ত করেছেন গল্পে। এবং এ-সত্যও অনস্বীকার্য 'পটভূমির পরিবেশ-পরিস্থিতি প্রকৃতি এবং সময়ের গতিবৈচিত্র্য অনিবার্যভাবে নির্ধারণ করে ছোটগল্পের চরিত্রচিত্তের গভীরতা, বিস্তৃতি ও স্তরসমূহ।'[১৯] এই পরিবেশ-পরিস্থিতিই লীনা ও কমলের দগ্ধ, বিপন্ন ও বিগলিত চেতনার কেন্দ্রমূলে অপরিসীম প্রাণচাঞ্চল্য সঞ্চার করেছে। তাদের 'গভীরতর অসুখ' প্রণয়ের আলোক-বিচ্ছুরণে হয়ে পড়েছে গৌণ, মরণোন্মুখ জীবন জেগে উঠেছে প্রণয়ের পরিচর্যায়, দৈবী শুশ্রূষাজাত পুনর্জন্মের মতো। 'কমল ডায়রী পড়ে শোনাচ্ছিলো লীনাকে। কামিনী গাছের তলায় ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে দু-জন। লনের ঝুলানো ফ্লোরেসেন্ট আলো বাঁকা হয়ে পড়েছে। স্তব্ধতার পাড় বুনছিলো গাঢ় কণ্ঠস্বর। কমল পড়ছিলো, অনেকখানি পড়া হয়ে গিয়েছিলো। শুনতে শুনতে লীনা ঢলে পড়েছে কমলের কাঁধে। কমলের কথাগুলো যেন লীনার সর্বাঙ্গ বুলিয়ে দিচ্ছে।'[২০] এই দিনপঞ্জি বা ডায়েরিতে বিধৃত হয়ে আছে মৃত্যুশঙ্কাময় জীবনকথা, মানব-অস্তিত্বের সর্বগ্রাসী হাহাকার :

> মনে হয়েছিলো মৃত্যু নামবে ঢলের মতো,···বুকের গহ্বর থেকে উদ্‌গত স্রোত হয়ে। রক্তবমনের সাথে নিঃশেষ হবে আমার এক জীবন। কালো থোকাথোকা কুৎসিত রক্ত। আমি স্বপ্নে সেই রক্ত দেখেছি। দিনে সেই রক্ত দেখেছি। রাত্রির অন্ধকারে সেই রক্ত দেখেছি। আমার চোখ ছিলো না আমার মন ছিলো না। আমার হাত ছিলো না। হাত দুটো যেন স্থির হয়ে গিয়ে মৃত্যুর আবাহনে পর্যবসিত হয়েছিলো। শক্ত হয়ে গেঁথে গিয়েছিলো যেন কাঁধে। রক্তবমনের দুর্গন্ধমাখা দিনগুলোতে। কোথাও আমি ছিলাম না।
>
> আমি কোথাও ছিলাম না। কিন্তু আজ আমি আছি। আমার প্রতি বিন্দুতে বিন্দুতে। আমার রক্তের প্রতি ফোঁটায়। আর বুকের মধ্যে

কোথায় সে রক্ত-বমির উদ্বেগ? সেখানে অমৃত যেন ঘন হয়ে প্রগাঢ় হয়ে এক অপূর্ব সুগন্ধে ভরাট হয়ে আছে: আর আমার হাত জীবনকে স্পর্শ করেছে। জীবনের সর্বাঙ্গ স্পর্শ করেছে। তোমার হাত, তোমার গ্রীবা, তোমার মুখ, তোমার চোখ, তোমার সর্বাঙ্গ।··· আমি যে সর্বযুগে বেঁচে গেছি, এর চেয়ে জীবনের আয়ু আর বেশী হতে পারে না।[২১]

কিন্তু জীবনের এই সর্বময় উন্মীলন হাসপাতালের চিকিৎসকদের কাছে স্বাস্থ্যকর মনে হলো না। লীনা ও কমলের এই 'মরতে বসে প্রেম করা'কে চিকিৎসকদের বৈজ্ঞানিক বিবেচনাবোধে মনে হয়েছে অসঙ্গত। তাঁদের যুক্তিনিষ্ঠ মন সরাসরি বাধা দিতেও সম্মত ছিলো না। কারণ এর ফলে 'মারাত্মক ক্ষতি হবে হার্টের'। 'নীতিনিয়ম নৈতিকতা বড়ো, না বাঁচবার সুযোগ, আয়ুর আনন্দ বড়ো—এই প্রশ্নের মুখে' বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন ডাক্তাররা। ফলে কোনো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি তাঁরা। নার্সরা ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক করে দিলেও ওদের উন্মাতাল জীবনাবেগ ও প্রণয়াবেগের কাছে তা গুরুত্ব পায়নি। এভাবেই এক পর্যায়ে প্রেমানুভূতির মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের নবতর স্বরূপ আবিষ্কার করলো কমল ও লীনা, মৃত্যু ও জীবনকে প্রেমের ঐশ্বর্যে সমান্তরাল বিবেচনা করলো। সমুদ্রের আবাহনে দু'জনের প্রণয়ে গড়া পৃথিবী হয়ে উঠলো বিশাল, বিস্তৃত, অসীমাকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল।

দ্বৈত জীবনের মরণজয়ী অভিযাত্রার গতি ব্যাহত হলো কমলের হাসপাতাল ত্যাগে। আত্মীয় স্বজনদের চেষ্টায় তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয় সুচিকিৎসার জন্য। 'আর ওদিকে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শয্যা নিল লীনা। যাবার সময় তার ডায়রীটা দিয়ে গিয়েছিলো কমল। সেইটে রয়েছে বুকে। কমল বলেছে ওতে, তার জন্যে প্রতীক্ষা করতে। ···চোখে জল নেই। বুকের রস শুকিয়ে গেছে। শ্যামলী প্রান্তর উষর মরুভূমি হয়ে গেছে এক নিমিষে।' লীনার নৈঃসঙ্গ্য, বেদনা ও শূন্যতা উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়ে গল্পের প্রথম পর্বের সমাপ্তি।

মানুষের প্রাণশক্তির আশ্চর্য উন্মীলন মরণোন্মুখ লীনাকে বাঁচিয়ে রাখে। তিন মাস অতিক্রান্ত হলেও তার জীবনীশক্তি থেকে যায় অনিঃশেষ। দুঃখ

তার প্রাণশক্তি অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয় যেন। 'অমোঘ মৃত্যুর ঠোঁটে ওর অমোঘ জীবন দপ্ দপ্' জ্বলতে থাকে। লীনার ব্যাধির উপযুক্ত চিকিৎসার যন্ত্রপাতি আসে বিদেশ থেকে। বিদেশে ট্রেনিং প্রাপ্ত একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ মেহেরপুর স্যানাটোরিয়ামে যোগদান করলে লীনার সুচিকিৎসার পথ হয় প্রশস্ত। বিদেশ-প্রত্যাগত ডাক্তারের প্রথম রোগী লীনা। ফলে, বিষয়টাকে চ্যালেঞ্জের মতো গ্রহণ করলেন নবাগত ডাক্তার চৌধুরী: 'শুরু হলো মৃত্যু আর চিকিৎসকের তুখোড় যুদ্ধ। মৃত্যুর অনিবার্য প্রসারের মুখে ডাক্তারের খুঁটিনাটি কৌশলের মরীয়া প্রতিরোধ। অদৃশ্য এক দ্বন্দ্ব ডাক্তারকে আবিষ্ট করে ফেল্লো। ভুলে গেলেন তিনি আর সব কিছু। তার জীবনের প্রথম জয়-পরাজয়ের মীমাংসায় ডুবে গেলেন তিনি তাঁর রোগিণীর জগতে। বাইরের সমস্ত পৃথিবীটা আপাততঃ যেন মিছে হয়ে গেলো।'[২২] জীবন ও মৃত্যুর এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ডাক্তারের অস্তিত্বেও সঞ্চারিত হয় নবতর প্রাণাবেগ। বৈজ্ঞানিক যুক্তি, চিকিৎসকের দায়িত্ব ও সচেতনতা অতিক্রম করে ডাক্তারের চেতনায় উদ্ভিদের মতো গজাতে থাকে প্রেমানুভূতি: 'জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্বের রহস্য, বিষাদিত সৌন্দর্য আর আত্মপরীক্ষার চাঞ্চল্য——সব মিলিয়ে সমস্ত পরিস্থিতিটা যেন তাকে উদ্ভিদের মতো শোষণ করতে লাগলো সর্বক্ষণ। মুখর হয়ে উঠলো ডাক্তারের তরুণ রক্ত। আত্মবোধনের আনকোরা ফল্গুধারা, রাহুগ্রস্ত এক রাজকন্যাকে উদ্ধারের স্বাপ্নিক সংগ্রামে লিপ্ত যেন এক রাজকুমার।'[২৩]

ডাক্তার চৌধুরীর সুনিপুণ চিকিৎসা ও আত্মবোধনের ফল্গুধারায় লীনার ওপর মৃত্যুর অধিকার-সীমা ক্ষীণ হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেলো নিঃশেষে। আরোগ্য লাভের পর চোখ মেললো লীনা——'শিশুর প্রথম চাউনির মত', যেন নবজন্ম হলো তার। অন্যদিকে 'আত্মপ্রসাদে গভীর হয়ে উঠলো ডাক্তার চৌধুরীর অস্তিত্ব। লীনার চোখে চোখ রেখে তাঁর সর্বাঙ্গ যেন উচ্চারণ করে উঠলো: 'তোমাকে ফিরিয়ে এনেছি আমি আরেক নতুন জীবনে। আমিই তোমাকে ফিরিয়ে এনেছি। তুমি আমার। তোমার এই নতুন জীবন আমারই। আমার ছাড়া আর কারো নয়।'[২৪] লীনার রোগমুক্তির পটভূমিতে তরুণ, অবিবাহিত ডাক্তার চৌধুরীর এই আত্ম-উদ্বোধন অযৌক্তিক নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ডাক্তার চৌধুরীর শুশ্রূষার

পেছনে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রেমানুভূতির অকৃত্রিম আলোক বিচ্ছুরণ যুগপৎভাবে বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু ঘটনার এই নতুন গতি আকস্মিকতায় বিস্মিত ও শিহরিত করে তুললো লীনার নবজন্মপ্রাপ্ত অস্তিত্বকে। ডাক্তার চৌধুরীর নিঃশঙ্ক ও নির্দ্বন্দ্ব প্রেমাবেগের মুহুর্মুহু আঘাত ও আত্মনিবেদনে লীনার অস্তিত্ব সম্মুখীন হলো নতুন সঙ্কটের :

> ডাক্তার চৌধুরীর প্রেমে লীনার প্রতি এক গভীর অধিকারবোধ ছিল। কমলের সঙ্গে এ বিষয়ে লীনা কোন তুলনা মনে আনতে পারেনা। কেননা কমল তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিলো। কিন্তু ডাক্তারের এই অধিকারবোধের বিরুদ্ধতায় লীনার মনের ভেতরেই বা জোর কোথায় ? সে এই বোধকে যুক্তিহীনভাবে উড়িয়ে দিতে পারে কই ? লীনা জানে এই বোধই ডাক্তারের সমস্ত মনোভাবের মূল ভিত্তি। এইটেই তার বড় দাবী, এইটেই তাঁর প্রেমের উৎস। আর এইখানে আঘাত করতে পারলেই তাঁকে সর্বোপায়ে অস্বীকার করা যায়। কিন্তু তা পারে কই লীনা![২৫]

সংশয় ও দ্বন্দ্বে দোদুল্যমানতার মধ্যে বিদেশ থেকে সুস্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে কমল। গল্পের তৃতীয় পর্ব-এর শুরু এই নতুন সঙ্কটের পটভূমিতে। যে উচ্ছ্বাস ও অদম্য আবেগ কমলের আগমনে সম্বর্ধনার জন্য লীনার চেতনায় সংরক্ষিত ছিলো—উপর্যুক্ত জিজ্ঞাসার আবর্তে যেন তা অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে যায়। 'প্রথম সাক্ষাতেই তারা বুঝতে পারলো এ দুজন সেই কমল আর লীনা নয়, এরা একেবারে ভিন্ন মানুষ।' তাহলে স্যানাটোরিয়ামে সংঘটিত ঘটনাপুঞ্জ কি রোগাক্রান্ত নর-নারী চিত্তের আস্বাভাবিক স্বপ্নকল্পনাময় বিভ্রম মাত্র ? না ডাক্তার চৌধুরীর উপস্থিতিজাত নব্য পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় লীনা ও কমলের এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণাম ? কমলের দিক থেকে অবশ্য জটিলতাটা কম। লীনার চৈতন্যে দ্বৈত স্রোতোধারার অভিক্ষেপ দ্বন্দ্বময় প্রতিক্রিয়ার সূচনা করে। গল্পের পরিণামে কমল নিজেদের প্রেমের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে লীনার উত্তর—'আমাকে কিছু দিনের সময় দাও তুমি।' সমস্ত গল্পের গতিপ্রবাহ এই একটিমাত্র সংলাপের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেলো যেন। এক মীমাংসাহীন, দ্বন্দ্বক্ষত অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলো লীনা। এ-যাবৎকাল-অর্জিত

অনুভূতি ও আবেগের উদ্বেল তরঙ্গ-কম্পন নির্জীব হয়ে গেলো তার জীবনে :

> কমল চলে যাওয়ার পর লীনা স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। প্রেম কোথায় সত্য——জীবনের লোভে, না জীবনের ওপারের নির্লোভে——এ প্রশ্নের উত্তর লীনা আর কখনো দিতে পারবেনা। তার শূন্য দৃষ্টিতে কখনও এর কোনো অপার্থিব ইঙ্গিত ভেসে উঠবে না আর। প্রেম যেন থুথুর মতো তার মুখে ভরে উঠেছে এখন, তিক্ত। এখনই ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে।[২৬]

চরিত্রচিত্তের অন্তর্ময়তার উন্মোচনে, তার প্রেমাবেগ, প্রণয়াবেগ তথা জীবনাবেগের দ্বন্দ্বসংঘাতে ও মীমাংসাহীন পরিণামে 'মানুষের মন' গল্পটি অনবদ্য। বিষয়ের দিক থেকে সমৃদ্ধ হলেও প্রকরণের প্রশ্নে 'মানুষের মন' ত্রুটিহীন নয়। যেমন গল্পের শেষ অনুচ্ছেদে মূল কাহিনী-বহির্ভূত প্রসঙ্গের অবতারণা——যেখানে সর্বজ্ঞ লেখক গল্পের উৎস উল্লেখ করে একটা সংশ্লেষ নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন। গল্পে বিধৃত বক্তব্যের প্রলম্বন বা পুনরুচ্চারণ গল্পের শৈল্পিক সংহতিকে বিপন্ন করেছে। প্লট নির্বাচনের ক্ষেত্রে লেখকের মনোভঙ্গি যে স্বতঃস্ফূর্ত নয়, বহিরারোপিত——গল্পের পরিণামে তারই ইঙ্গিত বিদ্যমান। প্রেম, সহানুভূতি, ঈর্ষা, বাৎসল্য প্রভৃতি মৌলিক মানবিক বৃত্তিগুলো যে ঘটনা ও পরিস্থিতি-নিয়ন্ত্রিত এই সংশ্লেষ নির্মাণই লেখকের অন্বিষ্ট।

কথাশিল্পীর জন্য অভিজ্ঞতার পরিধি সীমাহীন 'it is an immense sensibility, a kind of huge spider-web of the finest silken threads suspended in the chamber of consciousness, and catching every air-borne particle in its tissue'.[২৭] গল্পের বিষয়-নির্বাচনে হাসান হাফিজুর রহমান অভিজ্ঞতার উক্ত সংবেদনময় বিস্তারকে প্রয়োগ করেছেন। গ্রন্থের পরবর্তী গল্পসমূহে তাঁর অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যময় বিন্যাস সুস্পষ্ট।

'ছায়াহীন পক্ষ্মহীন পলকহীন' গল্পে নারী মনস্তত্ত্বের এক জটিল স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মরিয়ম। লেখক সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে তার অন্তঃপ্রদেশের গ্রন্থিগুলোকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন গল্পে।

হাবীব নামক এক প্রৌঢ়ের সাথে দাম্পত্য জীবন-যাপনের কাহিনী এ-গল্পের বহিরাবরণ, আর অন্তর্লোকে স্পন্দমান মরিয়মের যন্ত্রণা, বিক্ষোভ, অতৃপ্তি ও হাহাকারমথিত বেদনাময় চৈতন্যের করুণ উপস্থিতি। মরিয়মের জীবন-অভীপ্সা, আত্মজিজ্ঞাসা ও অস্তিত্বচেতনার স্বরূপসত্য এ-গল্পে বিধৃত হয়েছে। যেমন :

> অনুরণনহীন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার ওপারে এক নিরবলম্ব চেতনার জগৎ। আর তখনই স্বামীকে সে সাড়া দেয় ভিন্ন এক অস্তিত্ব নিয়ে, যেখানে দেহ আর দেহ। অন্তহীন বিস্তৃত সম্প্রসারিত দেহই শুধু। স্বামী সান্নিধ্যের প্রতি মুহূর্তেই ভিন্ন এই জগতে, শূন্যতার এই জগতে প্রবেশ করে মরিয়ম। মনকে সে কিছুতেই জাগাতে পারে না ; যে-মন দেহকেও পারেনা ঠেকাতে।
>
> বুকের মধ্যে এমন গহ্বরের মত শূন্যতা নিয়ে মানুষ বাঁচে কি করে? যখন নিজের অস্তিত্ব নিজের মাংস ও রক্ত নিজের বলেই মনে হয় না, তখন মানুষ বাঁচে কি করে?[২৮]

বহির্জগৎ ও প্রাত্যহিক জীবনাচরণের সাথে মনোজগতের এই দ্বন্দ্ব মরিয়মের অন্তর্নিহিত মনস্তত্ত্বময় বাস্তবতাকে কখনো কখনো দৈনন্দিনতা-অতিক্রান্ত করে তোলে। পরিস্থিতিতাড়িত জীবন কখনো বিদ্রোহে জ্বলে উঠতে চায়—কিন্তু একটা অনিবার্য সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে এই বিদ্রোহ-বহ্নি। মরিয়মের অবলম্বনহীন, মানসিক শুশ্রূষাহীন অবস্থার স্বরূপ উন্মোচনে লেখকের পরিচর্যাকৌশলও হয়ে ওঠে বাস্তবতা-অতিরেক, সার্‌রিয়ালিস্টিক :

> বিশ্বটা যেন গলে গলে পড়তে গিয়ে স্থির হয়ে ঝুলে পড়েছে, আটকে গেছে মরিয়মের মনে। শিরা-উপশিরাগুলো তার দেহে জমে গেছে। বিশাল বন্ধ্যাত্বে ঠাণ্ডা পাথরের মত ভারী হয়ে উঠেছে মরিয়ম।[২৯]

সমাজভিত্তি এবং হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় যন্ত্রণা-আর্তি-প্রত্যাশা—এই স্রোতের দ্বন্দ্ব-বৈপরীত্য মরিয়মের মধ্যে অপরিমেয় শূন্যতা ও হাহাকার সঞ্চার করে।

কিন্তু তার জীবনাবেগ লুপ্ত হয়না, সে কেবল আন্দোলিত হয় একটা সীমাহীন জিজ্ঞাসার আলো-অন্ধকারে :

> মানুষের ছায়া না থাকলে যেমন তা অমানুষিক, চোখের পক্ষ্ম না থাকলে যেমন তা ভৌতিক, দৃষ্টির পলক না থাকলে যেমন তা প্রাণান্তিক তেমনি অবিশ্বাস্য তেমনি অলৌকিক। ভৌতিক এবং প্রাণান্তিক স্বচ্ছ বিলুপ্ত এক পরিস্থিতি যে মরিয়মকে ঘিরে দপ্ দপ্ করছে। আর তার মধ্যে স্থির হয়ে আছে মরিয়মের নিরবলম্ব অস্তিত্ব। তবু সে বেঁচে আছে। কিছুতেই মরবে না। কেননা সে মরতে পারেনা।
>
> মরিয়ম কেবলই ভাবতে থাকে :
> যে দেহ থেকে সুধাও ওঠেনা, বিষও নয়, তা কেমন দেহ ?
> তাকি আর মানুষের দেহ ? সে কি মানুষ রয়েছে আর ?[৩০]

মরিয়মের নিরবলম্ব অস্তিত্ব উন্মোচনের অনুষঙ্গে লেখক পরিবেশ ও পরিস্থিতি-তাড়িত নারীজীবনের অন্তঃসারশূন্য জৈবনিক ও মানসিক অবস্থাকে বিন্যস্ত করেছেন। গল্পের ভাষাবিন্যাসে মাঝে মধ্যে চিত্রময়তা, কাব্যময়তা ও ব্যঞ্জনাসৃষ্টির পরিচয় থাকলেও লেখকের পরিচর্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবরণধর্মী। তিনি মূলতঃ গল্পবিষয়ের ওপরই সামগ্রিক মনোযোগ বিস্তারের পক্ষপাতী। অবশ্য 'ছায়াহীন পক্ষ্মহীন পলকহীন' গল্পে মরিয়মের আত্মসমীক্ষা কখনো কখনো বিশ্লেষণধর্মী করে তুলেছে পরিচর্যা-কৌশলকে। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের গভীর অনুসৃতি এ-গল্পের বিশেষত্বনির্দেশক প্রান্ত।

'অপমৃত্যু' গল্পে মানব-অস্তিত্ব ও তার গতিপ্রক্রিয়ার অন্যতর স্বরূপ বিধৃত। জলিচাচার অস্তিত্ব ও জীবনপ্রবাহ, ভ্রাতুষ্পুত্রীর শুশ্রূষায় আকস্মিকভাবে জেগে ওঠা তার জীবনের ধূসর গদ্যকাব্য এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে করুণ পরিণতি লেখকের অভিজ্ঞতার নতুনত্বে সমৃদ্ধ। ব্যক্তিভেদে মানব-অস্তিত্বের স্বরূপও যে স্বতন্ত্র, মরিয়ম (ছায়াহীন পক্ষ্মহীন পলকহীন) ও জলিচাচার অস্তিত্বসঙ্কটের ভিন্নতায় তা-ই প্রমাণিত। স্থিতিশীলতায় বিরূপ জলিচাচার বোহেমীয় জীবনবৃত্তে বাৎসল্যরস বিপন্ন, গতির এক উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহে তার জৈবনিক অভিযাত্রা :

তাঁর অস্তিত্বের পাশে রাহুর মতো পরম শত্রু সন্তান তিনটি—তাঁর সমগ্র অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

তাই জলিচাচা ছিন্নমূল, যেন গোড়া থেকে নিজেকেই টেনে ছিঁড়ে ফেলেছেন। সন্তানের প্রশ্বাস আগুনের হলকায় তাঁকে পোড়ায়। বাস্তভিটে দম বন্ধ করার হুমকিতে তাড়ায়। তাই তিনি ছুটে পালাচ্ছেন। আত্মরক্ষার জন্যে নয় যেন আত্মহননের জন্যেই ···কী এক ভীষণ আক্রোশ যেন আজীবন সঞ্চিত করে রেখেছেন —তিলে তিলে তাই শোধ করে দিয়ে যাচ্ছেন যাকে পাচ্ছেন তাকে, তাঁর অনভিপ্রেত অস্তিত্বের আঘাতে আঘাতে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে।[৩১]

'আত্মহনন', 'অনভিপ্রেত অস্তিত্ব' উক্তির মধ্য দিয়ে সর্বজ্ঞ লেখক ইঙ্গিতময় ও পরিণামস্পর্শী করে তুলেছেন গল্পকে। অকালে স্ত্রী-বিয়োগ জলিচাচার ছিন্নমূল জৈবনিক গতির একটা কার্যকারণ সত্যি, কিন্তু তার অস্তিত্বের গভীরেই নিহিত ছিলো বোহেমীয় রক্তস্রোত। হামিদাবানুর আশ্রয়ে ও শুশ্রূষায় বোহেমীয় রক্তপ্রবাহে লাগলো স্থিতির স্পর্শ, অকাল বসন্তের উদ্দাম হাওয়া। জীবনে সঞ্চারিত হলো গভীরতর অভীপ্সা। 'বসন্তে গাছগুলো যেমন পাতা বদলায়, জলিচাচাও তেমনি হু হু করে বদলে যেতে লাগলেন।' ক্রমাগত অতীত অপসৃত হয় তার জীবন থেকে— এ-যাবৎকাল-লালিত নিয়মানুবর্তিতা হয় বিপন্ন। চেতনার সামনে খুলে যায় প্রত্যাশার নতুন দিগন্ত। একদিন যখন হামিদাবানুর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় 'চাচামিয়া একটা বিয়ে করেন। বয়েস আর কত হলো, পঞ্চাশও নয় যেন'—তখন তাঁর জীবনের গতিতরঙ্গে জেগে উঠলো, অস্বাভাবিক, ধূসর ও গদ্যময় অনুভবের চরা : 'বাইরের বিস্তৃত আকাশ অসীম নীলিমায় জমাট বেঁধে উঠেছে। সূর্যের নীরব স্রোত নিচের পৃথিবীর সব কিছুকে গাঢ় হলদে করে দিয়েছে। সজনে গাছের খাঁজকাটা পল্লবিত ডাল জানালায় অর্ধেকটা ছেয়ে আছে। ···; জলিচাচার বুক কেমন বেদনায় ঝিম ঝিম করতে থাকে। ···বুকের ভেতর থেকে গল গল করে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে কথা স্রোতের মতো উচ্ছ্বাসে, হাওয়ার মতো অবাধে। এই অনুভূতপূর্ব আবেগে হঠাৎ মনে হলো,

এই ভালো।'[৩২] লেখকের প্রতীকী ও ব্যঞ্জনাময় পরিচর্যা বহিঃপ্রকৃতির সাথে জলিচাচার অন্তর্জগৎকে পরস্পরিত করেছে। এই অনুভূতপূর্ব আবেগ তার জীবনের 'এতদিনকার বাঁচার লড়াইটাই নাকচ করে দিয়েছে এক পলকে।' ফলে, তার জীবনে সূচিত হয় উদ্দামতা, প্রৌঢ়ত্বের বন্ধ্যা অরণ্যে জাগে বসন্তের উচ্ছৃঙ্খল আবাহন। সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির আলোক-বিচ্ছুরণে লেখক জলিচাচার অতীত ও বর্তমানের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন :

> বুকের ভেতর ক্ষুধা আর জ্বালা। পুড়ছে। তাঁর বন্ধ্যাত্বের সঙ্গে এই প্রেরণার যেন ভীষণ দ্বন্দ্ব। কখনো হঠাৎ হামিদাবানুকে এই উদ্ভট অবস্থা সৃষ্টির কারণ বলে মনে হলে দু'হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে তাকে। সেই যেন পরিকল্পিতভাবে ঠেলে ডাঙ্গা থেকে খরতর স্রোতের ভেতর ফেলে দিয়েছে তাঁকে।[৩৩]

কিন্তু 'সারাজীবনের বিপরীত অভ্যাস' থেকে আত্মমুক্তি তো সহজ নয়, বিরাগের ভাঙন তার সহজাত, কিন্তু অনুরাগের নির্মাণপ্রণালি তো তার অজ্ঞাত। জলিচাচার নবলব্ধ অনুরাগের প্রকৃতিও তাই অস্বাভাবিক। হামিদাবানুর প্রেক্ষণবিন্দু থেকে এক অনবদ্য উপমায় চিত্রিত হয়েছে জলিচাচার অনুরাগের স্বরূপ :

> অন্ধকার আকাশে তারা ফুটে উঠছে একটা দুটো করে। চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো। আকাশের দিকে চোখ পড়তেই হামিদাবানুর মনে হলো তারাগুলো যেন জলিচাচার চোখ দুটোর মতো চকচক করছে।[৩৪]

হামিদাবানুর অভিব্যক্তি অস্পষ্ট থাকেনা জলিচাচার কাছে—অকস্মাৎ তার জীবনের নবজাগ্রত উচ্ছ্বাস ও উদ্দামতা স্তিমিত হয়ে আসে। এক ঝড়-ঝঞ্ঝাময় রাতের অন্ধকার আবেষ্টনীতে মৃত্যু হয় জলিচাচার। এক ছিন্নমূল অস্তিত্বের ঘটে করুণ পরিণতি। বিরাগ ও অনুরাগের দ্বন্দ্বে বিক্ষত জলিচাচার জীবনকথার অনুষঙ্গে লেখক প্রতীকায়িত করেছেন মানবীয় অস্তিত্বসংগ্রামের অন্তর্ময় প্রান্তকে—যেখানে জীবনের যথাযথ অবস্থান থেকে কাউকে স্থানান্তরিত করলে সেই ব্যক্তির অস্তিত্ব গতিচ্যুত হয়ে পড়ে। জলিচাচার পরিণতির মধ্যে এক ছিন্নমূল অস্তিত্বের করুণ 'অপমৃত্যু'ই কেবল

অভিব্যক্ত হয়নি, ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সেই অন্তর্দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিত্বের সংঘাতের পরিণামফল অভিব্যঞ্জিত হয়েছে।

'অপমৃত্যু' গল্পের বিষয়, পটভূমি ও পরিণাম সম্পূর্ণতঃ নতুন হলেও প্লট-বিন্যাসের ক্ষেত্রে অসংহতি সচেতন দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। জলি-চাচার জৈবনিক গতি ও কর্মপ্রক্রিয়ার সাথে তার মর্মন্তুদ পরিণতি শৈল্পিক সামঞ্জস্য বহন করে না। লেখকের বোধ ও উপলব্ধির নতুনত্বই এ-গল্পের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য।

হাসান হাফিজুর রহমানের ছোটগাল্পিক শিল্প-অন্বেষার বৈচিত্র্যপ্রিয় গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের জন্য চারটি গল্প অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলো-চিত হলো। পরবর্তী ছয়টি গল্পেও লেখকের অভিজ্ঞতার বিচিত্র উৎস বিন্যস্ত হয়েছে। 'মাছ' গল্পটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মন্বন্তর, মহামারী ও মানবীয় সংস্কারের সমন্বিত বিন্যাসে স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করেছে। আসামের ভূমিকম্প পূর্ব-বাংলার জনজীবনে যে মর্মান্তিক প্রভাব বিস্তার করেছিলো, গল্পকাহিনীর ভিত্তিমূলে তাকে স্থাপন করেছেন লেখক। ফজল আলীর দারিদ্র্যপীড়িত জীবনে বিরাট কাতল মাছ ভক্ষণের সুযোগ এনে দেয় উল্লিখিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ—যদিও সবাই নিশ্চিতভাবে জানে এই দূষিত মাছ খেলে মৃত্যু হতে বাধ্য। যমুনা নদী থেকে একটা প্রকাণ্ড মাছ শিকার করে ফজল আলী নির্বিঘ্নে তা দিয়ে উদর পূর্তি করে, ফলে তার মৃত্যু ঘটে। কেবল এই মৃত্যু বর্ণনাই নয়, গ্রামীণ জীবনের সংস্কারের স্বরূপও এ-অনুষঙ্গে বিধৃত হয়েছে গল্পে। একটি অস্তিত্বকে ঘিরে গল্পটিতে অসংখ্য অস্তিত্বের আলোড়ন-শিহরণ-আতঙ্ক-ভীতি শব্দময় হয়ে উঠেছে :

> স্তব্ধ সমুদ্রের বুকে ঝড় উঠলে ঢেউগুলো যেমন আকুলি বিকুলি করে, তেমনি মানুষগুলো তচনচ হয়ে গেলো ভাবনায়। আতঙ্কে, অস্বস্তিতে, গায়েবী জেল্লার শিহরণে। ফজল আলীর মৃত দেহটার অস্তিত্ব ঘিরে থম থম করতে লাগলো ওদের অনুভূতি। কোনো অবিমিশ্র করুণা কিংবা সহানুভূতিতে নয়, নিজেদের দিকে চেয়েই। নিজেদের কথা ভেবেই ওদের বুকগুলো দুলে উঠলো, শিউরে শিউরে উঠতে লাগলো বারবার।[৩৫]

অভিজ্ঞতার বিন্যাসই শিল্প নয়; জীবনবোধ, বিষয় ও প্রকরণের সঙ্গতিই শিল্প। এই চেতনা এ-গল্প রচনার সময় লেখকের কাছে তেমন গুরুত্ব বহন করেনি বলেই মনে হয়। মানুষের সংস্কার, আতঙ্ক প্রভৃতির গভীর ও ইঙ্গিতময় বিন্যাসের সাথে ফজল আলীর স্ত্রীর প্রলম্বিত ও পুনরাবৃত কান্না গল্পের শিল্প পরিমিতিকে দুর্বল করেছে।

'বৌ' গল্পে বিধৃত হয়েছে গ্রামীণ জীবন-অন্তর্গত মানুষের সংগ্রাম, শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। হেছামুদ্দিনের প্রাত্যহিক জীবনপ্রবাহকে যেমন উপস্থাপন করেছেন সর্বজ্ঞ লেখক, তেমনি উদ্‌ঘাটন করেছেন জহুরুল মিয়ার সাথে তার শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের স্বরূপ। গল্পের পরিণতিতে হেছামুদ্দিনের জাগ্রত 'হৃদয়ের উত্তাপ' ও অকুতোভয় অধিকার-প্রতিষ্ঠা ইতিবাচক জীবনান্বেষায় উজ্জ্বল। 'মাণিকজোড়' গল্পে বুড়িমার স্মৃতি অনুষঙ্গবাহী কাহিনীস্রোতে লোকজ সংস্কারের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হয়ে উঠেছে মুখ্য। পাখির রক্তের মধ্যে সর্বনাশ প্রত্যক্ষ করেছিলেন বুড়িমা। লেখক ধ্বংসপ্রবণ মানবকর্মের নেতিবাচক প্রান্তকে নির্দেশ করেছেন বুড়িমার প্রাজ্ঞ জীবন-কথায়: 'মানুষের কলজে পুড়ে ছাই—খাক হয়ে গেছে। সেখানে রস-কষ আর কিছু নেই। ···বেহক রক্তের দাগ লেগে তারা সব বরবাদ হয়ে গেছে।'[৩৬] 'অনুতপ্ত পিতা' ও 'ইচ্ছার দেয়াল' দুই স্বতন্ত্র বিষয়ের গল্পরূপ। 'অনুতপ্ত পিতা'য় উত্তম পুরুষে বর্ণিত কাহিনীতে পেশাজীবী উকিলের প্রতারক চরিত্রের ঘৃণ্য স্বরূপ ও তার বাৎসল্যের বৈপরীত্যময় চারিত্রের উপস্থাপন ঘটেছে। 'ইচ্ছার দেয়াল' গল্পে বিবৃত হয়েছে একটা প্রণয়ের অসমাপ্ত ও অতৃপ্ত পরিণাম।

উল্লেখিত গল্পসমূহ বিষয় ও প্রকরণের প্রশ্নে লেখকের অমনোযোগিতার সাক্ষ্য বহন করে। 'মাণিকজোড়'-এ বুড়িমার আত্মকথন লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণের প্রয়োগে যথার্থতা অর্জন করেনি। রাফিজা চরিত্রের উপস্থিতিও অনিবার্য মনে হয় না। 'অনুতপ্ত পিতা'র শেষ বাক্যে 'আমার বুকে তেতো উঠে গেছে। মিষ্টি খাব কি, পালাতে পারলে বাঁচি' —নূন্যতম শৈল্পিক সংযমকেও অতিক্রম করে যায়। 'ইচ্ছার দেয়াল'-এ আবিদের জীবনে প্রণয়-উদ্ভাসনকে কোনো বস্তুগত ভিত্তি বা যুক্তিসঙ্গত কার্যকরণ সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। গল্পের পরিচর্যাও চরিত্রের

মনোজাগতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যরহিত। প্লটকে অনিষ্ট বিষয় হিসেবে গুরুত্ব প্রদান করলে গল্পে সামগ্রিক সাফল্য হয় বিঘ্নিত। কেবল প্লট-এ তৃপ্ত থাকা প্রধানতঃ অপরিপক্ক পাঠকের বৈশিষ্ট্য—প্লট, চরিত্র বা জীবন ও প্রকরণের পরস্পর অন্তর্বয়নই সচেতন পাঠকের কাম্য :

> The immature reader reads chiefly for plot ; the mature reader reads for whatever revelation of character or life may be presented by means of plot.[৩৭]

প্লটের প্রতি একাগ্রতা গ্রন্থভুক্ত কয়েকটি গল্পকে দুর্বল করেছে।

'পাখি' গল্পটি প্রতীকী। পাখি এ-গল্পে জীবনের বন্ধনহীনতা ও বহমানতার প্রতীক। জীবনের গতি অবরুদ্ধতা দ্বারা কেবল ব্যাহত ও বিপন্ন করাই সম্ভব—শুশ্রূষার প্রলোভন দ্বারা তাকে সুস্থ করা অসম্ভব। বন্দীত্ব ও জীবনকে সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত করা যায় না কখনো, কেবল মুক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে সংগ্রাম, সংঘাত এবং আত্মরক্ষার জীবনময় প্রেরণা। অবরুদ্ধ পাখিকে মুক্ত করে দেবার পর পাখি জীবনসঙ্কটের সম্মুখীন হলো বটে, কিন্তু জীবনের সেই গতিময় অগ্রযাত্রা অলক্ষ্য ইঙ্গিতে হয়ে উঠলো ব্যঞ্জনাময় দূরসঞ্চারী :

> দুটো কাক [সদ্যমুক্ত] পাখিটাকে আক্রমণ করেছে। আর সেই সবুজ পাখিটা বাঁচবার তাড়নায় ডানা মেলে দিয়েছে প্রাণপণে। দিগন্তের বন্ধন পার হয়ে যাচ্ছে সে তীব্র গতিতে। দুর্দান্ত বাতাসের অদৃশ্য দেয়াল সেই ডানার আঘাতে পরতে পরতে যাচ্ছে ভেঙে।...
>
> নীলাকাশ শোভিত অসীম শূন্যতায় মৃত্যু এবং জীবন মুখোমুখি হয়েছে। অক্লান্ত সংগ্রাম সেখানে। অনন্ত এর পরিসর।[৩৮]

ছোটগল্পে প্রতীকের ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে : 'The symbols are employed to emplify meaning and extend the scope of the story.'[৩৯]—'পাখি' গল্পটি এই উক্তির যাথার্থ্য বহন করে।

"আরো দুটি মৃত্যু" গল্পগ্রন্থে হাসান হাফিজুর রহমানের জীবনলগ্ন অনুভব ও উপলব্ধির বৈচিত্র্যময় স্বরূপ বিধৃত হয়েছে। জীবনবোধের বস্তুনিষ্ঠ বিস্তারে তাঁর গল্পের বিষয় ও প্রকরণ স্বতন্ত্র মাত্রায় অভিব্যক্ত। বিশেষ শিল্প-প্রকরণ হওয়া সত্ত্বেও জীবনচেতনা ও শিল্পাদর্শের স্বাতন্ত্র্য প্রতিটি যুগ ও যুগলালিত শিল্পীচৈতন্যে ছোটগল্পের রূপ ও প্রকৃতি বিভিন্ন হতে বাধ্য। কেননা, 'A particular artistic form does not flowrish in a particular age because of a happy accident, but because certain cultural, inventive, revolutionary, or popular forces combine to stimulate its growth ; so that finally, perhaps, it become the necessary and natural expression of the age.'[৪০] শৈল্পিক দিক থেকে কিছুটা অপূর্ণতা সত্ত্বেও যুগ ও সমাজ-সংলগ্ন জীবন-চেতনায় হাসান হাফিজুর রহমান স্বতন্ত্র শিল্প-অভিরুচি ও মাত্রা সংযোজনে সক্ষম হয়েছেন তাঁর "আরো দুটি মৃত্যু" গল্পগ্রন্থে।

দুই

হাসান হাফিজুর রহমানের অগ্রন্থিত আটটি গল্পের[৪১] তালিকা নিম্নরূপ : ১. অশ্রু-ভেজা পথ চলতে, ২. জরিমানা, ৩. অস্বস্তি, ৪. মৃত্যুর পরে, ৫. ভালোমন্দ, ৬. ঘর, ৭. অমীমাংসিত হুতাশন, ৮. প্রতি উত্তর। প্রথম তিনটি গল্প যথাক্রমে ১৯৪৭, ১৯৪৮ এবং ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী গল্পসমূহের অধিকাংশই ১৯৬৬-পূর্ববর্তী সময়ে রচিত। 'প্রতি উত্তর' গল্পটি সম্ভবতঃ অপ্রকাশিত। এ-গল্প আলোচনার জন্য লেখকের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ব্যবহৃত হয়েছে।

'অশ্রু-ভেজা পথ চলতে' হাসান হাফিজুর রহমানের প্রথম প্রকাশিত রচনা। লেখকের জীবনবোধের সূত্র নির্দেশের পটভূমিতেও গল্পটির ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রমজীবী মানুষের জীবনবাস্তবতা, তার বহিরারোপিত অসঙ্গতি, সংঘাত ও প্রতিবাদের উন্মোচনে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে গল্পটি। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তারিকউল্লার জীবনকথায় প্রতীকায়িত হয়েছে বাংলা-দেশের বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবনসমগ্রতা ; যেখানে পরশ্রমজীবী মানুষের বৈষয়িক দিকটিই কেবল নয়, হার্দিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির পটভূমিতেও

মনিব বা শাসকের নিয়ন্ত্রণ অপ্রতিরোধ্য। তারিকউল্লার সাথে তার মালিকের সম্পর্কের প্রকৃতি নিম্নরূপ :

> তাঁর ঝাল তিনি ঝেড়ে গেলেন। যার ওপর ঝেড়ে গেলেন তাকে মুখ বুজে থাকতে হয়। এক পক্ষ দ্বন্দ্ব এবং এক পক্ষের জয়োল্লাসই শোনা যায় এতে। বিপক্ষ এতে জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যায়; কিন্তু তার কোন প্রতিকার নেই। মনিবের এই তৃপ্তিটুকু জুগিয়েই তো তাদের তনুরক্ষা চলে।

এই পরশ্রমজীবী মানুষের মধ্যেও হৃদয়াবেগের অনিবার্য বহিঃপ্রকাশ বিদ্যমান। আয়তন-এর সাথে সম্পর্ক ও প্রণয় তারিকউল্লার অন্তর্জীবনের কাহিনী। অসুস্থ তারিকউল্লা কর্মে অক্ষমতার অভিযোগে চাকরিচ্যুত হয়। অতঃপর আয়তন-কে নিয়ে সে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে রাতের অন্ধকারে। কিন্তু মনিবের সর্ববিস্তারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি যে অসম্ভব! আয়তনও অভিন্ন মনিবের চাকরানি। ফলে, ধৃত তারিকউল্লা ও আয়তন সীমাহীন অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও পীড়নের পটভূমিতে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয়। যেখানে পরজীবী জীবনের শব্দপুঞ্জ রুদ্ধ হয়ে পড়ে: 'মুখে কথা আসেনা তারিকউল্লার। চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসে কয় ফোঁটা পানি। ওদের সম্বল শুধু এই।'

হাসান হাফিজুর রহমান সমাজলগ্ন অনুভবপুঞ্জকেই ছোটগল্পের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর স্রষ্টাচৈতন্যের অন্তর্গত অভিপ্রায় সম্ভবতঃ এই ছিলো যে, বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জীবনকে অবলোকন ও তার উপ-স্থাপন। 'অশ্রু-ভেজা পথ চলতে' গল্পে তিনি মূলতঃ অভিনিবিষ্ট সমাজদর্শক। শ্রমজীবী মানুষের জীবন বাস্তবতার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ তাঁর জীবনবোধ ও শিল্পাদর্শের ইতিবাচকতাকে নির্দেশ করে। লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ বিশেষ জীবনবলয়ের অসঙ্গতিকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে এ-গল্পে।

গল্পের প্লটকে বিষয় ও চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে চরিত্রের ক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে প্রধানতঃ দ্বন্দ্বে। সমালোচক উক্ত দ্বন্দ্বের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন এভাবে :

> The main character may be pitted against some other person or group of persons (*man-against-man*) ; he may be in

conflict with some external force—physical nature, society, or "Fate" (*man-against-environment*) ; or he may be in conflict with some element in his own nature (*man-against-himself*). (The conflict may be physical, mental, emotional or moral.)[৪২]

হাসান হাফিজুর রহমানের গল্পসমূহে এই ত্রিমাত্রিক দ্বন্দ্বের বিন্যাসই লক্ষ্য করা যায়। 'অশ্রু-ভেজা পথ চলতে' গল্পে প্রথমোক্ত দ্বন্দ্বই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এই দ্বন্দ্বের পরিণতি অবশ্য কোনো হাঁ-অর্থক ইঙ্গিত বহন করে না। 'জরিমানা' গল্পে এই দ্বন্দ্ব man-against-himself-এ পর্যবসিত।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়ায় জনজীবনে যে বিপর্যয়, দারিদ্র্য ও নিয়মনীতিবিরহিত জীবন-প্রক্রিয়া সূচিত হয়, 'জরিমানা' গল্পের কেন্দ্র-মূলে তার অবস্থান। এ-সময় চৌর্যবৃত্তি সাধারণ মানুষের নৈতিকবোধের কাছে চরিত্রহীনতা নির্দেশ করেনি। দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্যপীড়িত জনজীবনে তা জীবন রক্ষার অবলম্বন হয়ে উঠেছিলো।

> পঞ্চাশের এক ঝাঁক হন্যে মানুষ—চরকুলকান্দির মাটি, ধুলিকণা, উদ্ভিদ, গাছ তছনছ করে, আকুপাকু করে এক কণা অন্ন খুঁটে বেড়াতে লাগলো। চিন্তাবুদ্ধি লুপ্ত হলো ; মগজ গাঢ় ধোঁয়ার আচ্ছন্নতায়, মানবীয় সংস্কারকে আর উপলব্ধি করতে পারলো না কেউ। মাংস উবে গেছে, সমস্ত শরীরের ভেতরটা অসীম শূন্যতায় যেন ফেঁপে আছে। বাঁচার আগ্রহে মানুষগুলো হিংস্র হয়ে উঠেছিলো। ঝাঁক বেঁধে তৈরী হয়েছিলো চরকুলকান্দির হন্যে মানুষ—মালগাড়ি ভেঙে চাল-ডাল, খাদ্য লুট করে এনেছিলো যে যা পেরেছে তাই মরিয়া হয়ে। পুলিশ ও বাধা দিতে পারেনি। সে সময়ে গেছে এক ভাঙন, গ্রামের অখণ্ড জীবনটায় : সুখী হোক দুখী হোক মানুষেরা যে ঘর বেঁধেছিলো, তছনছ করে দিল তা। আমেরিকানরা টাকা ছড়িয়েছিলো, ঘর ছেড়েছিলো মেয়েরা।

এই সামগ্রিক বিপর্যয়ের ফলে জন-জীবনের নীতিবোধে যে অবক্ষয় সূচিত হয়, তার ফলাফল হলো সুদূরপ্রসারী। মনছুর ও তার সহযোগীরা

যখন বাহাদুরাবাদ স্টেশন ঘাটের রেল ওয়াগন থেকে মাল অপহরণ করে, তখনকার পরিবেশ-প্রকৃতির বর্ণনা :

> রাতের অন্ধকারে সেই বিরাট প্রান্তরকে মনে হয় কোন বিশাল হাঙ্গরের হাঁ করা মুখ, ইলেকট্রিক বাতিগুলো দু'পাশে জ্বল জ্বল করছে যেন দু'পাটি মাংস লোলুপ দাঁত।
>
> ' 'কেমন হয়ে আছে রাত্রি। কোন এক গভীর উত্তেজনায় গম্ভীর হয়ে গেছে অন্তঃসত্ত্বা অন্ধকার।

অন্ধকারের পটভূমিতে লেখকের প্রেক্ষণবিন্দু ইঙ্গিতময় করে তুলেছে প্রকৃতি ও মানুষের পরস্পরিত অবস্থান ও তার অন্তর্সত্যকে। ছাবেদ আলী দেওয়ানীর উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা সুনীতিবোধ উদ্ভূত। পরিণামে তার অন্তর্দ্বন্দ্বই (*man-against-himself*) হয়ে উঠেছে মুখ্য। দেওয়ানী অপহরণকে ঘৃণা করলেও, তা প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে প্রতিনিয়ত। কারণ, 'মনছুর তার ছেলে। চোরের সর্দার।' গভর্নমেন্ট চুরি বন্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়। ফলে এই অপহরণজনিত ক্ষতি-পুরণের জন্য নতুন পন্থা উদ্ভাবন করে কর্তৃপক্ষ। 'ঘাটের আশে পাশে তিন ইউনিয়ন জুড়ে জারী করলো পাইকারী জরিমানা। প্রতি এক টাকা ট্যাক্স পিছু এক শ করে টাকা। এই চুরির জন্যে রেলের যে ক্ষতি হয়েছে তা পুরণ করা হবে এই জরিমানা আদায় করা থেকে।' এই ঘোষণা স্বাভাবিকভাবেই সজাগ করে তোলে এলাকাবাসীকে। সম্মিলিতভাবে তারা এক সভা আহ্বান করে—সত্যিকার চোর শনাক্তি ও তার শাস্তিবিধানের জন্য। 'যারা আসল দোষী তারাই শাস্তি পাক, —জরিমানা দিক। নির্দোষ গাঁয়ের লোক চোরের শাস্তি ভোগ করবে কেন।' দেওয়ানীর মানসসঙ্কট এর ফলে প্রবল হয়ে ওঠে। সুনীতিবোধ-চালিত হয়ে সে জনতার বিপক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য প্রস্তুত থাকলেও সভায় গিয়ে তাঁর নীতিবোধ বিপন্ন হয়। নীতির সাথে পিতৃত্বের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত নীতিবোধ পরাস্ত হয়। দেওয়ানীর মানসদ্বন্দ্ব ও তার অমীমাংসিত পরিণামের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে গল্প। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে ও আশ্রয়ে লালিত জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকাকে পটভূমি করে রচিত গল্প 'অস্বস্তি'। কৃষিজীবী জেহারের অনুভব ও কর্মের মধ্য দিয়ে একটা

জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও সঙ্কটের উন্মোচন ঘটেছে। জেহারের ব্যক্তিগত অনুভূতি কৃষিনির্ভর জীবনবলয়ের সমগ্রতার অঙ্গীকারে তাৎপর্যপূর্ণ :

> চারিদিক থেকে ঘিরে আসছে ছোটা-ফাটা মেঘ। মনটা আবার বিষাক্ত হয়ে ওঠে ওর। এবারে যতোবার বৃষ্টি হয়েছে, শীল ঝরিয়েছে শুধু। শীলের ঝাপটা থেকে একটা ধানও বাঁচবে কিনা কেউ জানে না, সে বিশ্বাসও নেই। তারপর অনাহারের কঙ্কাল বছর। আগুনের ঝাপটার মতো নিষ্ঠুর তীব্র ক্ষুধার নিষেপষণে বিষ-তপ্ত। আকাল, মড়ক। বৌ আছে তার ঐশ্বর্য নেই। ছেলে আছে তার আবেদন নেই। তোমার পুরুষত্ব আছে, মূল্য নেই তার।

বাঙালির সামাজিক ও জৈবনিক ট্রাজেডির এক মর্মন্তুদ স্বরূপসত্য বিন্যস্ত হয়েছে 'মৃত্যুর পরে' গল্পে। সামাজিকভাবে যে মানুষ স্বীকৃতি পায়নি কখনো, মৃত্যুর মধ্যদিয়ে তাতে উঠলো সে। উত্তমপুরুষে বর্ণিত কাহিনী প্রান্তিক চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে এ-গল্পে। 'ভালোমন্দ' কৌতুক-আশ্রয়ী গল্প। কিন্তু কৌতুকের মধ্য দিয়েও যে মানব চরিত্রের অন্তর্নিহিত স্বরূপ উন্মোচন করা যায়, গল্পটি তার সার্থক দৃষ্টান্ত। গল্পটি উত্তম পুরুষে রচিত, কেন্দ্রীয় চরিত্র আবিদ। 'দর্শন-রাজনীতি-অর্থনীতি-পুরাতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব-ইতিহাস আর ধর্মতত্ত্বের' ব্যাপক পরিসরে যে আবিদের জ্ঞানময় পদচারণা, তার চিত্তে বাৎসল্যরসের উজ্জীবন তার জ্ঞান সাধনাকে বিঘ্নিত করে। আবিদের চিত্তে বাৎসল্যরসের প্রতিক্রিয়া নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পের সমাপ্তিতে সমগ্র গল্পের সারাৎসার বা ভাববস্তু অভিব্যঞ্জিত :

> আবিদ ইদ্দিসের কাছে পরাজয় মানে নি। কিন্তু জীবনের নিয়মের কাছে, জীবনের দাবীর কাছে হেরে গেছে। একটা সামাজিক ডাকের তাগিদ দিয়ে চিরাচরিত সমাজ তাকে গ্রাস করে নিয়েছে। তার এতদিনকার বিচ্ছিন্নতার, বিরোধিতার নিয়ম ছেঁড়ার সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে গেল।

মানুষের অন্তর্জীবনের মৌলিক সমস্যাভিত্তিক গল্প 'ঘর'। শহীদের বাস্পতা জীবনের মাঝখানে তার পূর্ব-প্রণয়িনীর আকস্মিক আবির্ভাব জটিল

পারিবারিক ও মানসিক সঙ্কট সৃষ্টি করে। কিন্তু বাস্তববুদ্ধিজাত বিবেচনা-বোধ ও মনোবলের ফলে দ্বন্দ্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় শহীদ। শহীদের চেতনায় অনুরণিত মীমাংসার স্পন্দন সমগ্র গল্পকাহিনীর চুম্বক : 'জীবনের ভোগের চেয়ে জীবন অনেক বড়। এ এক তত্ত্বকথা। কিন্তু বড় সত্য। শহীদের মনে এ-সত্যই বারবার বাজতে লাগলো।' ডালিয়া মিলিয়ে গেলো বিস্মৃতির অন্ধকারে আর প্রেম ও শুশ্রূষার হাত নিয়ে তার মনোযোগ নিবদ্ধ হলো স্ত্রী নাজমার প্রতি। শহীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও উত্তরণ 'ঘর' গল্পকে বিশিষ্ট করেছে। 'অমীমাংসিত হুতাশন' এবং 'প্রতি উত্তর' দুই বিপরীত পটভূমিকেন্দ্রিক গল্প। বিত্তহীন নাসিম আলীর জীবনে বন্যা আকস্মিক অর্থ আয়ের পথ প্রশস্ত করে দেয়, কিন্তু এই অর্থ সংগ্রহের স্থিতি তাৎক্ষণিক বলেই অমীমাংসার যন্ত্রণায় সে দগ্ধ হতে থাকে। গল্পে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হলেও নাসিম আলীর অনুভূতি ও আন্তরজাগতিক প্রতিক্রিয়ার উন্মোচনে কেন্দ্রীয় চরিত্রের সাথে লেখকের প্রেক্ষণবিন্দু সমান্তরাল মাত্রা রচনা করেছে। একজন আধুনিকা তরুণীর অন্তর্দ্বন্দ্বক্ষত জীবনের শব্দচিত্র 'প্রতি উত্তর' গল্প। নাসরিন-এর জীবনকথা-অনুষঙ্গে লেখক এক উচ্চাভিলাষী অহংবোধসম্পন্না নারীর উত্তমন্যতা, ঔদ্ধত্য, আত্মবিশ্বাস, আত্মবিলুপ্তি (যার পরিণাম সীমাহীন দ্বন্দ্বে) প্রভৃতিকে সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রকৃত পক্ষে একজন নাসরিনের জীবন-কথা না হয়ে 'প্রতি উত্তর' বিশেষ জীবনবলয়ের নারীচরিত্রের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এ-গল্পে নাসরিনের দ্বন্দ্ব প্রথমতঃ পারিপার্শ্বিকতার সাথে (*man-against-environment*) এবং পরিণামে নিজের বৈপরীত্যময় অতীত ও বর্তমানের সাথে (*man-against-himself*)। 'অমীমাংসিত হুতাশন' গল্পেও এই দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ভিন্ন। অর্থ-আয়ের সুযোগ নাসিম আলীর অন্তরস্থিত দ্বন্দ্বকে উন্মোচন করে দেয়। বিত্তশালী যাত্রীদের সাথে আচরণের মধ্যে মূলতঃ শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে।

হাসান হাফিজুর রহমানের অগ্রন্থিত আটটি গল্প কেবল বিষয়বৈচিত্র্যে নয়, লেখকের জীবনবোধের সমগ্রতাচারী স্পন্দনের শিল্পরূপ। তাঁর গল্পে বিধৃত জীবন বাঙালি জাতির জীবন সমগ্রতাকে অঙ্গীকার করেই গৌরবময়।

তিন

বিষয়ের প্রতি একাগ্রতা কিন্তু প্রকরণে অমনোযোগিতা হাসান হাফিজুর রহমানের একাধিক গল্পে বিদ্যমান। কিন্তু যে বিষয়ের মধ্যে জীবনের বৈচিত্র্য,সমস্যা, সঙ্কট ও ইতিবাচক প্রত্যাশা নিহিত, তার মূল্য কম নয়। "আরো দুটি মৃত্যু" গ্রন্থের একাধিক গল্পে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। আলোচিত আঠারোটি গল্পে লেখকের মানসপ্রকৃতির জীবনমনস্ক প্রান্ত বারবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেছেন : 'অবলীলাক্রমে ও অবহেলাক্রমে লিখনের ফলশ্রুতিতে আমাদের অধিকাংশ কথাসাহিত্যিক চিহ্নিত। দু একজন ছাড়া প্রায় সকলেরই অধ্যয়নবিমুখ স্বল্পজ্ঞান, ইতিহাস অচেতনা, চরিত্রকল্পনার দৈন্য, ঘটাবিন্যাসে অজ্ঞতা এবং সর্বোপরি ভাষাজ্ঞানের অপরিণতি অত্যন্ত পীড়াদায়ক।'[৪৩] উল্লিখিত সীমাবদ্ধতার অনিবার্য অভিক্ষেপ সত্ত্বেও বৈচিত্র্যময় বিষয়-অন্বেষা, জীবন ও জগৎ-সম্পর্কিত বস্তুনিষ্ঠ উপলব্ধি হাসান হাফিজুর রহমানের গল্পকে বিশেষত্বপূর্ণ করেছে। তবে অধ্যয়ন ইতিহাসচেতনা, চরিত্রকল্পনা ও ঘটনা বিন্যাসের সযত্ন প্রয়াসও তাঁর একাধিক গল্পে বিধৃত।

প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিভাগোত্তর কালের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের সাথে হাসান হাফিজুর রহমান সংশ্লিষ্ট ছিলেন নিবিড়ভাবে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন, উনসত্তুরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধকে পটভূমি করে কোনো গল্প রচনা করেন নি তিনি, কবিতায় তিনি এসব বিষয়কেই অনবদ্য বাণীমূর্তি দান করেছেন। তবে কি কবিতার তুলনায় ছোটগাল্পিক শিল্প-অন্বেষা তাঁর সৃষ্টাচৈতন্যে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব-পূর্ণ ছিলো ? জাতীয় জীবনের প্রতিটি আন্দোলন ও সংগ্রামের সাথে তাঁর যে নিগূঢ় সম্পৃক্তি, তা নিঃসন্দেহে একজন শিল্পীর অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধির স্বাক্ষরবাহী। হয়তো এই অভিজ্ঞতাপুঞ্জকে শিল্পরূপ দানের আকাঙ্ক্ষা তাঁর চেতনায় বিদ্যমান ছিলো, অকাল মৃত্যু সেই সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করেছে চিরদিনের জন্য। কিন্তু কবিতায় যে বিষয়নিষ্ঠ এবং জীবন ও

সমাজসংলগ্ন হাসান হাফিজুর রহমানের উপস্থিতি বিদ্যমান, ছোটগল্পে তার স্বাক্ষর অস্পষ্ট নয়, শিল্পাদর্শের এই অন্তর্গত ঐক্য যে কোনো সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের জন্যই গৌরবব্যঞ্জক।

তথ্যনির্দেশ

১ হাসান হাফিজুর রহমানের প্রথম প্রকাশিত রচনা, 'অশ্রু-ভেজা পথ চলতে' ১৩৫৪ বৈশাখ ও আষাঢ় সংখ্যা 'সওগাত'-এ প্রকাশিত হয়।

২ ''আরো দুটি মৃত্যু''. প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, লেখক সংঘ, পূর্বাঞ্চল শাখা, ঢাকা. গ্রন্থে গল্পগুলোর রচনাকাল উল্লেখিত হয়েছে ১৯৫০–১৯৬৬

৩ Short Fiction : Shape and Substance, Edited and with an Introduction by William Peden, 1971, Boston, Page 26

৪ 'আরো দুটি মৃত্যু'; ''আরো দুটি মৃত্যু''. পৃ. ১

৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ২

৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪–৫

৯ পূর্বোক্ত পৃ. ৫

১০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯–১০

১১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১৩ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'পূর্ব পাকিস্তানী কথাসাহিত্য', ''আধুনিক বাংলা সাহিত্য'', প্র. প্র. ১৯৬৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৪৩

১৪ 'আরো দুটি মৃত্যু', পৃ. ২

১৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

১৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১৭ সৈয়দ আকরম হোসেন, গল্পগুচ্ছের প্রকরণ : কতিপয় মোটিফ, দৈনিক বাংলা, বাইশে শ্রাবণ, ১৩৮৯ / ১৯৮২

১৮ 'মানুষের মন' ; "আরো দুটি মৃত্যু" পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪-১৫

১৯ সৈয়দ আকরম হোসেন, পূর্বোক্ত

২০ 'মানুষের মন', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫

২১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

২২ পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

২৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ২২-২৩

২৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

২৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

২৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

২৭ Henry James, 'The Art of Fiction', Selected Literary Criticism, 1963, Penguine Books, Great Britain, p. 85

২৮ 'ছায়াহীন পক্ষীহীন পলকহীন' ; "আরো দুটি মৃত্যু", পৃ. ৪১

২৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

৩১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

৩২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯

৩৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

৩৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

৩৫ 'মাছ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

৩৬ 'মাণিকজোড়', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪

৩৭ Laurence Perrine, Story and Structure (1950), 2nd ed. 1966, New York, p. 58

৩৮ 'পাখি' ; "আরো দুটি মৃত্যু", পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪

৩৯ Blaze O. Bonazza and Emil Roy, Studies in Fiction, 1965, New York, Introduction, p. 12

৪০ H. E. Bates, The Modern Short Story, 1941, Reprinted 1956, Boston, p. 222

৪১ উল্লেখিত আটটি গল্প হাসান হাফিজুর রহমানের পারিবারিক উৎস এবং পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত। গল্পগুলো গবেষকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে।

৪২ Laurence Perrine, Story and Sructuere, p. 59

৪৩ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬